মানসভ্রমণ

হৃদি-জয়রামবাটীতে চলো মন

প্রসাদ

‘এসেছে শরৎ, হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে’। দেখতে পাচ্ছ না, প্রকৃতির উদার অঙ্গনে কেমন একটা সাজো-সাজো রব উঠেছে? মা আসছেন! বুঝতে পারছ না? হায় হতভাগ্য! এই দুরন্তগতি শহরের কর্মচঞ্চল বজ্রনির্ঘোষে কীভাবে তার সন্ধান পাবে, বলো? এখানে মুক্ত আকাশের অমল নীলিমা যন্ত্রসভ্যতার কালো ধোঁয়া শোচনীয়ভাবে ঘন কালিমালিপ্ত হয়ে আছে। ‘শরৎ প্রভাত নিরাময় নির্মল’—কবির এই গভীর কথার মর্ম তুমি বুঝবে কী করে? বুঝতে হলে এখান থেকে পালাতে হবে কিছুদিনের জন্য। কিন্তু যাবে কোথায়? তুমি তো সবসময়েই ‘কর্ম নামে মাকড়সাটার বিষম জালে বাঁধা’ রয়েছ!

সত্যিই কি এই ‘কর্মের-কলরব-ক্লান্ত’ শরীর আর মনটাকে নিয়ে কোথাও পালাবার কোনও উপায় নেই? কে বলেছে নেই? জান না, ‘‘কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, মনে মনে?’’ চলো মন, এবার বেরিয়ে পড়ি মানসভ্রমণে, মায়ের চরণে। সেখানে সবসময় সবার জন্য জায়গা আছে। হ্যাঁ, আমার মতো নিতান্ত অভাজনের জন্যও জায়গা আছে মায়ের বাড়িতে। আছে এক চিরন্তন উদার আহ্বান—‘‘আয় অশুচি আয় রে পতিত, এবার মায়ের পূজা হবে।’’ সে এক ভারি মজার জায়গা! ‘‘সেথা নাই মন্দির নাই পূজারি/ নাই শাস্ত্র নাই রে দ্বারী,’’ সেখানে গিয়ে যে-কেউ নির্ভয়ে মায়ের চরণ ছুঁতে পারে। ‘‘মা বলে যে ডাকবে এসে মা তাহারেই কোলে লবে।’’ চলো মন, আনন্দে নাচতে নাচতে যাই, মা ডেকেছে মোদের কী আর ভাবনা ভাই? মা আছেন আর আমি আছি, এই তো সহজ ব্যাপার। এর বেশি আর কিছু বোঝার বা বোঝানোর আছে কি? চলো, যত ‘বোঝা’-র বোঝা দূরে ফেলে মায়ের কাছে ছুটে যাই!

এবার পুজোয় সব রকম নাগরিক কলকোলাহল, বিকট বিকট শব্দবাজির কানঘাতী আর প্রাণঘাতী আওয়াজ, পরিবেশ-বিদূষণ, বিপুল জনসংঘট্ট ছেড়ে চলে যাই দূরে কোথাও। ‘‘যে পথ সকল দেশ পারায়ে উদাস হয়ে যায় হারায়ে’’—সেই অচেনা অজানা রাঙামাটির মন-ভোলানো মেঠো পথ ধরে এগিয়ে যাই চলো সর্বতীর্থসার জয়রামবাটীতে। মন, তুই যাবি আর আমি যাব, আর যেন কেউ নাহি থাকে। শহরের দূষিত কালিমা থেকে কিছুক্ষণের জন্য পালিয়ে যাই দুরিতবারিণী কালী-মার আশ্রয়ে। চলো মন, কিছুক্ষণের জন্য তোমার ওইসব স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট,

ওয়াই-ফাই, হোয়াটস্‌অ্যাপ, ফেসবুকের সোশ্যাল মিডিয়ার জঞ্জাল-জাল কেটে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ি। আজি শুভদিনে 'মায়ের' ভবনে অমৃতসদনে চলো যাই, চলো চলো চলো ভাই।

কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকবেই বা কোথায়? মায়ের তো অসংখ্য সন্তান আছেন, তাঁরা কতদিন আগে থেকেই সব থাকার জায়গা বুক করে রেখেছেন। আর কীভাবেই বা যাবে তোমার এই জরাজীর্ণ শরীরটা নিয়ে? যখন শরীরে ক্ষমতা ছিল তখন তো কতরকম প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলে। এখন, 'দিনে দিনে দীনের ফুরাইল দিন'। আজ সুদূর, বিপুল সুদূর, যতই তার ব্যাকুল বাঁশি বাজাক, আমার যাওয়ার যে কোনও উপায় নেই, কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার। মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সেকথাটাই বা ভুলব কী করে?

আরে, মানসভ্রমণের এই তো সুবিধে! যখন খুশি, যেভাবে খুশি, যতবার ইচ্ছে যাওয়া যায়। পাঁজি-পুঁথি, অশ্লেষা-মঘা দেখতে হয় না, স্কুল-কলেজ-অফিস থেকে ছুটি নেওয়ার দরকার হয় না, মালপত্র গোছাতে হয় না, ক্যাব-ট্রেন-বাস-প্লেনের টিকিট, হোটেলে বা গেস্ট হাউসে রুম—কিছুই আগে থেকে 'বুক' করতে হয় না, শুধু লাগে বুকভর্তি ব্যাকুলতা, ভালবাসা, ইচ্ছে। ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য, মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য আর বেশি কী লাগে, বলো? চলো তাহলে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ভবের এই বন্ধ বাতুলালয় ছেড়ে ভাবের মুক্ত মাতুলালয়ে (সোজাকথায়, আমার 'মামার বাড়িতে') যাওয়া যাক।

পথ কি খুব দূরে নাকি? আরে দূর! দূর কেন হবে? মায়ের কাছে দূর কভু দূর নয়। অতএব, 'চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে!/ চলো মুক্তিপথে,/ চলো বিঘ্ন-বিপদ-জয়ী মনোরথে'। আর এ কি তোমার পার্থিব ভ্রমণ নাকি হে? এখানে দেশ-কাল-নিমিত্তের কোনও চোখ-রাঙানি নেই। এখানে মনের ইচ্ছামাত্রই মনোরথে চড়ে পৌঁছনো যায়, আলোকের চেয়ে দ্রুতবেগে।

[আলোকের চেয়ে দ্রুতবেগে যাওয়া সম্ভব নাকি? বিজ্ঞানীরা তো বলছেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আলোর গতিবেগই দ্রুততম (২.৯৯৭৯২৪৫৮× ১০^{৮}মিটার/সেকেণ্ড), তার চেয়ে দ্রুতবেগে কিছুই যেতে পারে না। এর ওপরেই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ। ঠিক কথা। কিন্তু এ-বিষয়ে বিজ্ঞানীরা তো আইনস্টাইনকে আর বিজ্ঞানের শেষ কথা বলে মানেন না। আইনস্টাইনের সমসাময়িক আর-একজন জার্মান মহাবিজ্ঞানী কার্ল এর্নস্ট লুডভিগ্ মার্কস্ প্লাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭) 'কোয়ান্টাম বিজ্ঞান' নামে পদার্থবিজ্ঞানের একটা নতুন অভাবিত দিক উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা বলছেন, শুধু বলছেন না, পরীক্ষাগারে প্রমাণ করেও দেখাচ্ছেন, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে, এক জায়গার তথ্য অন্য এক জায়গায় পাঠাতে কোনও সময় লাগে না। যাই হোক, পুজোর সময়ে এইসব বিজ্ঞানের কচকচি থাক।

আর-একটা কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। মহাভারতে 'যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর'-এ (বনপর্ব) যক্ষের একটা প্রশ্ন ছিল ''বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর কে?'' মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেছিলেন, ''মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর।'' আজকের দিনে হয়তো এই প্রশ্নটা হত ''আলো অপেক্ষা শীঘ্রতর কে?'' যাই হোক, উত্তরটা একই হত, ''মন।'']

এই দেখো, এক লহমায় মায়ের কাছে পৌঁছে গেছি নাচতে নাচতে, গান গাইতে গাইতে— ''এল তোর দুষ্টু ছেলে, তুষ্ট করে নে মা কোলে।'' ওই দেখো, ''দুয়ার পাশে জননী হাসে হেরিয়া নাচনী।'' চলো, গিয়ে মায়ের শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়ি। ''আর

আমি যে কিছু চাহিনে, চরণতলে বসে থাকিব,/ আর আমি যে কিছু চাহিনে, 'জননী' বলে শুধু ডাকিব।" মায়ের জন্য যা কিছু এনেছ, সব নিঃশেষে ঢেলে দাও মায়ের পদতলে, নিবেদন করে দাও নিজেকেও, কায়মনোবাক্যে। ‘‘আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,/ আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা—/ সব দিতে হবে, সব দিতে হবে।"

তুমিও চোখ মেলে চেয়ে দেখো, মন। তোমার সামনে স্বয়ং জগন্মাতা, শ্রীশ্রীমা সারদা! মায়ের এই 'সারদা' নামের তাৎপর্য জানো কি? শোনো তাহলে এক মহান সন্ন্যাসীর মুখে সারদা নামের রহস্য। ‘‘সা—সামীপ্যে। স অর্থাৎ সাধনা, সহিষ্ণুতা, সেবা, সমদৃষ্টি, সদাচার, সরলতা; স অর্থে সবুজ বা তারুণ্য, সাদা বা শুচিতা। এসব দৈবী গুণাবলীর প্রতীক যিনি এবং যাঁর ধ্যানে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি হয়। র—রক্ষণে। কামক্রোধাদি ষড়রিপু, বিপদ-আপদ, আধি-ব্যাধি, রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু থেকে যিনি রক্ষা করেন। দা—দানে। জ্ঞানভক্তিবিবেকবৈরাগ্য, ধর্মঅর্থকাম-মোক্ষ, সুখসম্পদ, আনন্দ যিনি দান করেন। যিনি জীবের ভরণ, পোষণ ও রক্ষণ করেন তিনি সারদা।"

চলো মন, মা ডাকছেন, বাইরে থেকে এবার ভেতরে যাই। মাকে বলো, ‘‘বাহির ছেড়ে ভিতরেতে আপনি লহো আসন পেতে।" ঢুকেই দেখো, মায়ের পুজোর ঘর, ঠাকুরের কী সুন্দর ছবি, পুজোর উপকরণ সব কী সুন্দরভাবে সাজানো আছে! এখানে ঠাকুরের দিব্য উপস্থিতি অনুভব করো, মন। মহাতীর্থক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছ। প্রণাম করো, গড়াগড়ি দাও, এখানকার পবিত্র রজঃকণা সারা গায়ে মেখে নাও। সংগ্রহ করে নাও তোমার শেষ পারানির কড়ি, ‘‘সময় পাবে না আর, নামিছে অন্ধকার।" নাও, এবারে মা প্রসাদ দিচ্ছেন, কৃতাঞ্জলি হয়ে বিনম্রচিত্তে, নতমস্তকে গ্রহণ করো। কোথায় পাবে এই দেবদুর্লভ মহাপ্রসাদ? ঠাকুরের পুজো করেছেন স্বয়ং জগন্মাতা, তিনি স্বহস্তে তোমাকে সেই মহাপূজার প্রসাদ দিচ্ছেন! ভাবতে পার, তোমার কী অপরিসীম সৌভাগ্য? মায়ের দেওয়া পুজোর প্রসাদ মাথায় তুলে নে রে ভাই। সাধু নাগমহাশয় হলে তো শালপাতার ঠোঙাটা, ফলের বিচিটাও ফেলে দিতেন না, সবটাই 'মাতৃদত্ত মহাপ্রসাদ' বলে ভক্তিভরে গ্রহণ করতেন, আনন্দে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতেন 'বাপের চেয়ে মা দয়াল' বলে। সত্যিই তাই। স্বনামধন্য পণ্ডিত তারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন, ‘‘মনুষ্যজগতে পিতা এবং মাতাই মূল। সেখানেও ভারতবর্ষ বলেছেন : 'পিতুরপ্যধিকা মাতা'—পিতার চেয়ে মাতা বড়ো।" নাগমহাশয় নিজে সুদক্ষ চিকিৎসক ছিলেন, স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সবকিছু অবহিত হয়েও এইসব পবিত্র জিনিস অম্লানবদনে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। তিনি দেখিয়ে দিলেন মায়ের দেওয়া প্রসাদ গ্রহণ করার আদর্শ পদ্ধতিটা কী। তুমি নাগমহাশয় নও জানি, তাই বাস্তবে অতটা পারবে না। কিন্তু এখন তো তুমি সবটাই মনে মনে কল্পনা করছ, তাই মনে মনে নাগমহাশয়কে স্মরণ করে মাতৃপ্রদত্ত প্রসাদ সম্পূর্ণত গ্রহণ করো। জগদম্বার পাবনহস্তের স্পর্শপূত সবকিছুই অমৃতজ্ঞানে মাথায় তুলে নাও, পরম ভক্তিভরে। এটা ভাল, ওটা মন্দ, এটা ত্যাজ্য, ওটা গ্রাহ্য বলা চলবে না। ভক্তকবি গাইছেন শোনো—‘‘তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব/ সুখদুখ তব পদধূলি বলে মাথায় লব।/ আমি কী আর কব॥"

চলো এবারে উঠি, মায়ের আঙিনায় গিয়ে দেখো, সেখানে চাঁদের হাট বসেছে! এতদিন যাঁদের কথা কেবল বইতেই পড়েছ, এখন তাঁদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ! ওই দেখো, সবাই তোমাকে সহর্ষে স্বাগত জানাচ্ছেন।

চিনতে পারছ, রামদাদু প্রসন্নমুখে দাওয়াতে বসে

বসে তামাক খাচ্ছেন? তামাকের ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে ঢুকছে কি? ভয় নেই, এসব দাদুর দিব্য-তামাকের ধোঁয়া, এতে পরোক্ষ ধূমপানের (passive smoking) কোনও আশঙ্কা নেই! যাও, গিয়ে দাদুর পায়ের ধুলো নাও। দাদুটি বড় সোজা মানুষ নন, বৈকুণ্ঠের মা লক্ষ্মী আর স্বয়ং নারায়ণকে মেয়ে-জামাই বানিয়ে বসে আছেন!

শ্যামা দিদিমাও কিছু কম নন, যাও ওঁকে প্রণাম করো, মন। তিনিও বড় সোজা মানুষ নন—তিনি আবার 'সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা'। ওই দেখো, শ্যামা দিদিমা তোমাকে দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠছেন, বলছেন, ''ও সারু, দ্যাখ্ মা, আমার লাতিন (লাতিন < নাতিন < নাতি, এই শব্দটি বাঁকুড়ায় ব্যবহৃত হয়) আঁইচে, কতদিন পরে। উয়াকে খাঁতে দেমা, আহা, দাদার আমার মুখটা শুকাঁই গেছ্যেক গো! কুথা থেক্যে আসছো, দাদা? বেঁচ্যে থাকো ধন, বেঁচ্যে থাকো—।" দিদিমা আর থামতেই চান না।

বাঁকুড়ার মানুষ খুব অতিথিবৎসল হন, অতি সহজেই দূরকে নিকট করে নিতে পারেন, নাহলে কি আর স্বয়ং জগদম্বা মর্ত্যলীলা করবার জন্য বিলেত-আমেরিকা ছেড়ে 'আধা-সাঁওতালী-বাঁকড়ো' জেলাকে বেছে নেন! এই 'আধা-সাঁওতালি... বাঁকড়ো' কথাটা শুনে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না যেন, এটি স্বয়ং স্বামীজী-প্রদত্ত লিখিত কমপ্লিমেন্ট! বিশ্বাস না হয়, স্বামীজীর নিজের হাতে লেখা—কোনও মৌখিক বক্তৃতার অনুলিখন নয়—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটির 'আহার ও পানীয়' অধ্যায়টি আর একবার পড়ে দেখুন। অবশ্য, স্বামীজী ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের মহানগরী কলকাতার মানুষ, তাই তিনি 'বীরভূম-বাঁকড়ো'-কে এক ব্র্যাকেটে নিয়ে 'আধা-সাঁওতালি' বলে স্বভাব অনুসারে একটু নির্দোষ ঠাট্টা-তামাশা করতেই পারেন। আমরাও সেটা মাথা পেতে মেনে নিয়ে তার উত্তরে বলতেই পারি, ''স্বামীজী, আপনি তো সর্বক্ষণ সেই 'আধা-সাঁওতালি... বাঁকড়ো' জেলার মেয়ে-জামাইয়ের পদতলে বসে আছেন। আপনার চোখ দিয়েই তো আমরা তাঁদের মহিমা বুঝছি। তাহলে?"

স্বামীজী কথাটা শুনে আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠতেন। যাইহোক, স্বামীজী কখনও স্থূলশরীরে জয়রামবাটীতে যাননি। এখন এই মায়ের বাড়িতেও তাঁকে দেখবার আশা নেই, তিনি কোন উচ্চস্তরে ধ্যানে নিমগ্ন, কে জানে!

বাঁকুড়ার স্থানীয় উপভাষার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমাদের অভ্যস্ত নাগরিক কানে প্রথম প্রথম একটু অদ্ভুত লাগতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলবেন যে একটা সুন্দর মিষ্টি সুরেলা টানে কথা বলেন এখানকার মানুষ। এখন অবশ্য সর্বগ্রাসী নগরায়ণ এবং সর্বশক্তিমান মিডিয়ার দাপটে সেইসব স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিলীয়মান। তাও যদি গ্রামাঞ্চলের দিকে যান, এই উপভাষার কিছু কিছু রেশ শুনতে পাবেন, বিশেষত প্রবীণ মানুষদের কাছে। তখন ওইসব সহজ সরল মানুষদের আন্তরিকতাপূর্ণ কথ্যভাষা আপনার ভালই লাগবে।

মামারা, মামিমারা, দিদিরা, দাদারা, জয়রামবাটীর অগণিত মানুষজন—সবাই তোমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন, দেখো মন। তাঁদের সকলের চোখে-মুখে আনন্দ আর ধরছে না! যাও, গিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করো। তাঁদের সকলকে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে কুশল সংবাদ নাও। এইরকম দুর্লভ সুযোগ সহজে আর কখনও পাবে না, মন। কীভাবেই বা পাবে? মায়ের নরলীলায় অংশগ্রহণ করবার জন্য এঁরা কিছুদিন মায়াশরীর ধারণ করে মায়ের সঙ্গে জয়রামবাটীতে এসেছিলেন, এখন এঁরা সকলেই দিব্যলোকে মায়ের সঙ্গে অধিষ্ঠান করেন। এঁরা মায়েরই অংশ,

মায়েরই শক্তি। এঁদের আরাধনা করলে মায়েরই আরাধনা করা হয়, মন।

ওই দেখো, আর একজন দিদি হাসিমুখে হাতছানি দিয়ে তোমাকে ডাকছেন। চিনতে পারছ না? আরে, ইনিই তো সেই বিখ্যাত রাধুদিদি। এসো, এসো, দিদিকে প্রণাম করো। আরে না, না, এখন আর তাঁর মাথার রোগ নেই, তোমাকে বেগুন-টেগুন ছুঁড়ে মারবেন না। দিদি তো মায়েরই এক শক্তি, মা যোগমায়া। ঠাকুর ওঁকে তো পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্য ডেপুটেশনে পাঠিয়েছিলেন ‘মাতৃলীলা’ নাটকে একটি নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করতে। নাহলে মাকে কি পার্থিব শরীরে বেশিদিন ধরে রাখা যেত নাকি? ওই দেখো, ছোটমামিও রয়েছেন রাধুদিদির পেছনে। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক, সহাস্য। যাও। ওঁকেও প্রণাম করো। আরে, পার্থিব রঙ্গমঞ্চে এঁদের মায়া-অভিনয় তো দেখেছ (মানে, বইতে পড়েছ), এখন এই দিব্য গ্রিনরুমে এঁদের মেক-আপ বর্জিত প্রকৃত স্বরূপটাও দেখো! হ্যাঁ, ঠিকই দেখছ, এঁদের সকলের মধ্যে মাকেই দেখতে পাচ্ছ তো? সেটাই তো স্বাভাবিক। মা নিজেই তো এইসব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রূপ ধরে লীলা করে গেছেন।

যাও মন, যাও। সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করো। তার আগে ওই দেখো, নলিনীদিদি তোমার জন্য ছোলাভাজা, লঙ্কাকুচি, শসাকুচি, নারকেলকুচি আর আমতেল দিয়ে কী অপূর্ব ঝালমুড়ি বানিয়ে এনেছেন! আবার তার সঙ্গে রয়েছে গরম গরম বেগুনি আর ‘লাটসাহেবের গাড়ি’, মানে জিলিপি! বাঁকুড়ার মুড়ি বিখ্যাত, খেয়ে দেখো। সেই মুড়ি খেতে খেতে গল্প করো সবার সঙ্গে, যতক্ষণ ইচ্ছে।

মন, এবারে আনন্দে সময় কাটাও এই মহামাতৃতীর্থে। চিন্তা কোরো না, তুমি এখন দেশ-কাল-নিমিত্তের বাইরে, ‘অতীত-আগামী-কাল-হীন, দেশহীন, সর্বহীন’ এক লোকাতীত পরমানন্দময় দিব্যজগতে এসেছ। জাগতিক কোনও নিয়মকানুন এখানে খাটবে না। মহামায়ীর আপন দেশে আইনকানুন সর্বনেশে! সত্যিই সর্বনাশা, সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায় এখানে—কর্মফল, জাগতিক বাসনা, মনের টেনশন। এই সৃষ্টিমুখর ‘লাজুক গাঁয়ে এসে, থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা’। তাই তোমার মতো কর্মব্যস্ত মানুষ এখন আর ‘ঘড়ি’-দাস নয়, তুমি এখন ‘হরি’-দাস। ‘কাঁচা আমি’-র ছোট্ট খাঁচাটা থেকে বেরিয়ে এসে তোমার ‘পাকা আমি’-র ফাঁকা মাঠে অবাধে বিচরণ করো, ফুসফুসে ভরে নাও দূষণমুক্ত বিশুদ্ধ শীতল বাতাস। শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানির শরমের ডালি বিসর্জন দিয়ে এসো আমোদরের জলে। আবার তোমার সেই প্রাণচঞ্চল সদানন্দময় শৈশবে ফিরে যাও—‘‘তোর কাছে আসব মাগো শিশুর মতো,/ সব আবরণ ফেলব দূরে জগৎ জুড়ে আছে যত।” মায়ের প্রবীণ শিশু মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কাছে শিখে নাও কীভাবে ‘মায়ের কাছে’ যেতে হয়—‘‘মা, তোমার কাছে যখন আসি, তখন আমার মনে হয়, আমি যেন ছোট্ট শিশু, নিজ মায়ের কাছে যাচ্ছি।”

স্নানাহার হয়ে গেছে? তাহলে চলো, এবারে বেরিয়ে পড়ো মায়ের গ্রাম দেখতে। দিবানিদ্রার বদ-অভ্যাস নেই তো? থাকলেও, আপাতত ভাতঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে, ‘ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়ে’, পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে পড়ো। ‘যে দেশে রজনী নাই’ সেই দেশের অনেক লোকের সন্ধান পাবে। পূজনীয় স্বামী প্রেমেশানন্দজীর লেখা বহুপরিচিত প্রভাতি সংগীতটির দুটি শব্দ পরিবর্তন করে গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে চলো মাতৃতীর্থ-পরিক্রমায়—

‘‘মা সারদা-দাস-দাস জয় সবাকার,
মা সারদা-লীলাস্থান জয় বার বার।”

মায়ের স্মৃতিপূত সব লীলাস্থলগুলি একে একে দেখতে থাকো, মন। সর্বশক্তি দিয়ে, সর্বাঙ্গ দিয়ে,

সর্বসত্তা দিয়ে অনুভব করো এখানকার আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, গাছপালা—সবকিছুকে। সকলের সঙ্গে পরিচয় করো, মন। তোমার ক্ষত-বিক্ষত শরীর-মন জীবনপথের সমস্ত ক্লান্তি ভুলে মায়ের স্নেহভরা কোলে এসে শীতল হোক, তোমার এই মহাতীর্থে আসা সার্থক হোক।

প্রথমেই চলো সদ্‌গোপ-বংশীয় শ্রীক্ষেত্র বিশ্বাসের উটজ-প্রাঙ্গণে, সেখানে দেখা হবে এক অসাধারণ ভক্তিমতী সাধিকার সঙ্গে, তাঁর নাম মানগরবিনী দেবী। গ্রামসম্পর্কে রামদাদুর বোন, তাই মায়ের পিসি, ভানুপিসি। আমাদের ভানুদিদি। এখন বয়স হয়েছে ভানুদিদির, তাও কী সুন্দর দেখতে তিনি! পাতলা চেহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সদাপ্রফুল্ল মানুষ। এই সরল মানুষটি এক লহমায় নিঃসংকোচে সকলকেই আত্মীয়তাসূত্রে বেঁধে ফেলতে পারেন। সর্বদাই তিনি ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিতা হয়ে থাকেন, হাত নেড়ে, নেচে গেয়ে কথা বলেন। ভগবানের কথা, ঠাকুরের কথা, মায়ের কথা বলতে বলতে চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যায়, শ্রোতার অবস্থাও তথৈবচ! আরে তুমি-আমি তো কোন ছার, ব্রহ্মানন্দ-মহাসাগরকেও তোলপাড় করার দুর্লভ ক্ষমতা আছে তাঁর! স্বয়ং রাখাল মহারাজকেও ‘কালো বেরাল কে পুষেছে পাড়াতে’ গানটি শুনিয়ে ভানুদিদি এমন কাঁদাতে পারেন যে মহারাজের জামা ভিজে যায় প্রেমাশ্রুধারায়!

মন, দিদিকে প্রণাম করো, দিদির জন্য যে গরদের শাড়ি, গরম আলোয়ান (শীত আসছে তো!), উলের কম্বল আর সন্দেশ এনেছ, সেসব তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করো। আর, ভাল রকম কিছু প্রণামীও দিয়ো বাপু, এবারের বর্ষাতে ওঁর বাড়ির চালের খড়গুলো সব পচে গেছে, সেসব নতুন করে ছাইতে হবে। ‘‘সেই ফাঁকে নিস তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি শেষকালে।’’ কীভাবে ঘর ছাইতে হয়, ভানুদিদির কাছে শিখে নাও তাড়াতাড়ি। অতএব মন, ‘‘এইবেলা নে ঘর ছেয়ে।’’

হে ভগবান, কাকে কী প্রণামী দেবে? ভানুদিদি কোথায় এখন? তিনি কি অদৃশ্য হয়ে গেলেন নাকি? না, কোথাও যাননি, ঘরের ভেতরে গেছেন তোমার জন্য একটু প্রসাদ আনতে। ঝকঝকে কাঁসার থালায় মুড়ি-কড়াই ভাজা, আর একটা রেকাবিতে অনেকগুলো গরম গরম তালের বড়া নিয়ে এসেছেন—‘‘লাও দাদুভাই, ইটা ঠাকুরের পেসাদ বঠ্যে! আমাকে তো ঠাকুর ভিখারি করে পাঠাইছেন, তাই ইয়ার বেশি তো কিছু দিবার সাধ্য নাই, ভাই!’’ ভাদ্রমাস কবে শেষ হয়ে গেছে, দিদি এখনও পাকা তাল কোথায় পাচ্ছেন সেসব নিয়ে ভেবো না। একটা ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে দিদি কী সুন্দর জল এনেছেন, দেখো। জলটা খেয়ে দেখো, জল নয় গো, স্বর্গের অমৃত, তোমার তপ্ত দেহমন এক মুহূর্তেই শীতল হয়ে যাবে।

‘‘লাতিনের আমার পেট ভর্‌্যে নাই, গো। ঠিক আছে, তুমাকে একদিন ভালো কর্‌্যে খাঁওয়াই দিব। ঝাল ঝাল পোস্তর বড়া খাঁওয়াব। এখানে তো পোস্ত পাওয়াই যায় না গো। দোকানে ইতট্যুকু আনে। বেশি খুঁজলে (মানে, চাইলে) বল্যে, আর লাই (নেই), আর হব্যাক লাই (আর পাওয়া যাবে না)।’’ ভানুদিদির কথা আর শেষ হওয়ার নয়, ‘‘ছুটলে কথা থামায় কে?’’

মন, এমন সুযোগ আর পাবে না, ভানুদিদিকে এখন পুরনো দিনের কথা জিজ্ঞেস করো। ঠাকুর আর শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ওঁদের আত্মীয়দের কথা, পূজনীয় মহারাজদের কথা, ভগিনী নিবেদিতার কথা, অন্যান্য ভক্তদের কথা—সব শুনতে চাও। ভানুদিদির চরকা-কাটার শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হাত নেড়ে রসিক ঠাকুর যেসব রঙ্গরসের গান গাইতেন সেসব গানও শুনতে চাও (ভগিনী নিবেদিতাও ভানুদিদির কাছে শুনতে চেয়েছিলেন সেই দিব্যসংগীত)। আর, বিশেষ করে শুনতে চাও, দিদির ‘বড় নাতি’-র কথা।

কে তিনি? সে কী! জান না, ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রকে ভানুদিদি 'বড় নাতি' বলতেন।

এই দেখো! আশ্বিনমাসের ছোট দিনের বেলা তো, শেষ হয়ে আসছে। ঠাকুরের সন্ধ্যারতির সময় হল, মায়ের বাড়িতে ফিরে চলো এবার। ভানুদিদিকে আবার প্রণাম করে ওঁর কাছ থেকে বিদায় নাও। আবার পরে কখনও এসে তাঁর পুণ্যকথা শুনো। মানগরবিনী কথা অমৃত সমান।/দুচোখের জলে ভেসে শুনে পুণ্যবান॥

এভাবে এক-একদিন জয়রামবাটীর এক-একজন ভক্তের বাড়িতে চলো, মন। অনেক কিছু জানতে পারবে। যেমন—ভাবিনী মাসি, লালু দাদা (লালমোহন দাস, সাতবেড়ে গ্রামের বাসিন্দা, পেশায় ধীবর, বাউল গান করতেন), সতীশ সামুই মহাশয়ের মা (মাকে সবজি বিক্রি করতেন), আমজাদ দাদা (শিরোমণিপুরের মুসলমান মজুর, মাঝে মাঝে ডাকাতি করতেন বলে বদনাম ছিল) নবাসনের বউদির (নাম : মন্দাকিনী রায়) কাছে যাও, গল্পগুজব করো, মন্দাকিনীর পুণ্যস্রোতে স্নান করার তৃপ্তিলাভ করবে।

জয়রামবাটীর চৌকিদার, মায়ের অম্বিকাদাদার সঙ্গে দেখা করতেও ভুলো না, মন। ভেবে দেখো, যে-মা জগদম্বিকা তাঁর সৃষ্টি সংসারকে রক্ষা করেন, পাহারা দেন, তাঁকে পাহারা দিতেন আমাদের অম্বিকামামা! কতবড় সাধক তিনি, ভেবে দেখো! মা নিজে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাচ্ছেন—''তুমি আমার অম্বিকাদাদা, আর আমি তোমার সারদা-বোন। এর বেশি তোমার আর কিছু জানবার দরকার নেই।'' সত্যিই তো, তার বেশি আর কী হিজিবিজি জানার আছে? ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতানো নিয়েই তো কথা, তাহলেই তো মুক্তি করামলকবৎ! চলো অম্বিকামামার কাছে, প্রণাম করো। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব সাঙ্গোপাঙ্গ আর সঙ্গীদের সঙ্গেও সম্বন্ধ পাতাও, তাঁদের সকলকেও তোমার 'চিরপথের সঙ্গী' করে নাও। যুক্তপাণি হয়ে, নতশিরে তাঁকে বলো, ''মামা, আপনি যেভাবে মাকে পাহারা দিচ্ছেন, আমাকেও সেইভাবে পাহারা দেবেন যাতে ছটা বজ্জাত চোর যেন কখনও রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে সিঁধ কেটে আমার মাটির ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার মোহনিদ্রার সুযোগ নিয়ে যথাসর্বস্ব লুট করে পালাতে না পারে। আর, যখন আমার ভবের খেলা সাঙ্গ হবে, সেদিনও আপনি আপনার ওই মহাশক্তিধর লাঠি আর আলোকময় লণ্ঠন হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াবেন আমার কাছে, তাহলে মৃত্যুরূপী কালসর্পটাও ভয়ে আমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। সেদিন আপনি আমাকে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অপরিচিত পথে আলো দেখিয়ে, পাহারা দিয়ে, পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবেন মায়ের কাছে, 'আমি যে পথ চিনি না'। একটু দেখবেন, মামা।''

এঁরা সব গ্রামের সরল মানুষ, এঁদের সংস্পর্শে এলে তোমার অনেক শহুরে সংস্কার কমে যাবে, সমাজের সকলস্তরের মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারবে। তোমার অনেক কমপ্লেক্সের গ্রন্থিমোচন হবে। টেনশন কমে যাবে, ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার, কোলেস্টেরল, লিপিড প্রোফাইল সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আশ্চর্য হয়ে দেখবে, ''এই মানুষেই আছে রে মন, যারে কয় মানুষরতন।'' এই ভারতের মহামানবের মহাসাগরের পুণ্যসলিলে স্নান করে তুমি নবজীবন পাবে।

চলো, এবারের মতো মানসভ্রমণ শেষ করা যাক। মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে চলো আপন ঘরে। খুব কঠিন কাজ, কার্যত অসম্ভব কাজ। মায়ের কাছ থেকে কি কখনও বিদায় নেওয়া যায়? বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা ও চিত্রপ্রযোজক সোহরাব মোদির (১৮৯৭-১৯৮৪) কথা মনে করা যাক। ১৯১৮

সাল, সদ্যযুবক সোহরাব তাঁর দাদার কাছে শোনেন মায়ের কথা। সেই দাদা ভাইকে বম্বে থেকে কলকাতায় পাঠালেন মাকে দর্শন করার জন্য। কলকাতায় এসে তিনি বাগবাজারে ছুটলেন। অপরিচিত পারসি যুবকের ব্যাকুলতা দেখে মায়ের দ্বারী স্বামী সারদানন্দজী অনুমতি দিলেন মাতৃদর্শনের। তিনি মাতৃসকাশে গিয়ে নিবেদন করলেন তাঁর প্রার্থনা—“মায়ীজী, কুছ মূলমন্ত্র দিজিয়ে জিসসে খুদা পহচান হো যায়।” শারীরিক অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করে করুণাময়ী তখনই কৃপা করলেন যুবক সোহরাবকে। সোহরাব কথা বলছিলেন হিন্দিতে, মা বাংলায়। মাতাপুত্র দুজনেই দুজনের কথা বুঝতে পারছিলেন বিনা বাধায়। এবারে সোহরাব বিদায় নেবেন, সাশ্রুনয়নে বললেন, ‘মায়ীজী, ম্যায় যা রহা হুঁ।” মা প্রবল আপত্তি জানালেন, বাংলায় বললেন, “ ‘যাই’ বলতে নেই বাবা, বলো ‘আসি’।” সোহরাব তো শুনে অবাক, তিনি মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে ‘যাচ্ছেন’, আর মা তাঁকে আদেশ করছেন ‘আসছি’ বলতে! বঙ্গাল মুলুকে কি এইরকমই হয় নাকি? এখানে ‘যাওয়া’ মানে যাওয়া নয়, ‘আসা’, ফিরে আসা! মায়ের কাছে বারবার ফিরে আসা।

তারপর কেটে গেছে বহু কর্মব্যস্ত বছর। মোদিজি বৃদ্ধ হয়েছেন, এখন মাকে মনে পড়েছে তাঁর—“সন্ধ্যা হল গো—ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।/ অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো॥/ ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো—সব যে কোথায় হারিয়েছে গো।/ছড়ানো এই জীবন তোমার আঁধাঁর-মাঝের হোক-না জড়ো॥”

সোহরাব মোদি স্বামী নিরাময়ানন্দজীর কাছে তাঁর গভীর অনুভূতির কথা বলেছেন, “তারপর বহু বছর কেটে গিয়েছে, আমি এখন বৃদ্ধ। জীবনের এই দীর্ঘ সময় মায়ের কথা আমি কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন আমি ওপারের ডাকের অপেক্ষা করছি—যেকোনও সময় সেই ডাক এসে যেতে পারে। আজ পৃথিবীর কোনও কিছুরই আমার কাছে আর আকর্ষণ নেই। এখন, এতকাল ভুলে-থাকা মাকেই শুধু আমার মনে পড়ছে। তাঁর সেই শেষকথাগুলি আমার কানে বাজছে : ‘যাই বলতে নেই বাবা, বলো আসি।’ এখন আমি বুঝতে পারছি—যা তখন আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল—আমি তাঁর কাছ থেকে ‘চলে যেতে’ চেয়েছিলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত ‘যেতে’ পারিনি। আমরা কেউই [যেতে] পারি না। মায়ের কাছে আমাদের ফিরে আসতে হবেই। আমার জীবনের অন্তিম উপলব্ধি—আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে আসছি— !”

এটাই হয়, ভগবানকে ভোলা যায় না, “ভুলেও থাকি, তবুও দেখি ভোলে না মা একটিবার।” তাই আমরা সাহস করে বলতে পারি—“আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়।” কারণ, “আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার প্রেমের তো নাই ক্ষয়।” এই পরম ভরসা বুকে নিয়ে চলো মায়ের কাছে। বিদায়কালীন প্রণাম করো মায়ের পাদপদ্মে। কী হল, তোমার দু-চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে কেন? তোমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, নাহলে দেখতে পেতে, মায়ের দুটি চোখও জলে ভাসছে। কোনওমতে কান্না চেপে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মা বললেন, “আবার এসো, বাবা। সাবধানে পথে চলবে। কখনও গোঁ ভরে চলবে না। কোনও বিপদে পড়লেই সোজা আমার কাছে চলে এসো, বাবা। পথ তো চিনেই গেলে। আর, প্রতিদিনই আমাকে ফোন কোরো, বাবা। মন-ফোনে আমাকে যখন খুশি ফোন করতে পারো, কেবল ‘মা’ বলে ডায়াল করলেই হবে। আমি তো সবসময়েই তোমাদের জন্য আছি। আমি তোমার ফোনের অপেক্ষায় থাকব। তোমার সকল ভালবাসায়, সকল আঘাতে সকল আশায়, আমি আছি, তোমার কাছে আমি আছি। জানবে, তোমার আর কেউ থাক বা না থাক,

তোমার একজন 'মা' আছেন। আমি তোমার পাতানো মা নই, কথার কথা মা-ও নই, সত্যি সত্যি আমি তোমার মা। আমি তোমার জন্ম-জন্মান্তরের মা, বাবা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ব না, বাবা। কখনও না।" আর কথা বলতে পারলেন না মা। চোখে আঁচল চাপা দিলেন।

"আমি চলিয়ে গিয়েছি 'আসি' বলে,
তুমি বিদায় দিয়েছ আঁখিজলে
কত আশিস করেছ, বলেছ,—বাছারে,
যেন সাবধানে থেকো;
আর পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণ ভরে
'মা, মা' বলে ডেকো।"

কিন্তু এসবই তো আকাশকুসুম কল্পনামাত্র। নিজেকে নিজেই ভুলিয়ে রাখা। এতে কি সত্যি আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় কিছু? হয়, অবশ্যই হয়। এতক্ষণ আমরা যা করলাম, তাকে বলতে পারি মায়ের রূপধ্যান, লীলাধ্যান। ভেবে দেখুন, যতক্ষণ এই লেখাটি পড়ছিলেন, ততক্ষণ কি আপনিও আমার সঙ্গে জয়রামবাটীতে মানসভ্রমণ করছিলেন না? মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার অংশটা পড়তে গিয়ে আপনার চোখ দুটিও কি জলে ভরে যায়নি? যাবেই, কারণ আপনিও তো মায়েরই সন্তান, ভক্ত-মানুষ। তাহলে দেখুন, আমরা তো এতক্ষণ সুনির্দিষ্টভাবে (মানে, highly focussed হয়ে) মায়ের ধ্যানই করলাম, তাই না? অর্থাৎ যাকে আপনি নিছক কল্পনা ভাবছিলেন, তা আসলে ছিল মাতৃধ্যান। কারণ, তা লক্ষ্যবিহীন স্রোতের ধারায় ভেসে যাওয়া কতকগুলো অসার কল্পনার আবর্জনা নয়। একে বলে সৃজনাত্মক কল্পনা। এর দ্বারা আপনি সচেতনভাবে সৃষ্টি করছেন আপনার নতুন মানস-ভুবন, নতুন মানসিক বাসস্থান—যার কাব্যিক নাম 'হৃদি-জয়রামবাটী'। এতদিন আপনারা ভক্ত কবিদের গানে 'হৃদি-বৃন্দাবন' বা 'হৃদি-কামারপুকুর' এইসব শব্দ পেয়েছেন, এবারে আপনি আপনার নবলব্ধ সৃজনশীল কল্পনা দিয়ে নিজের পছন্দমতো গান লিখছেন, "হৃদি-জয়রামবাটীতে চলো মন।"

যদি 'আকাশকুসুম কল্পনা'ই বলেন, তাহলে বলব—সারাক্ষণ কি ঠিক এই কাজটাই করছি না আমরা? মনের কাজই তো হচ্ছে সবসময় নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা (যার অপর নাম চিন্তা করা)। আকাশ-পাতাল আবোলতাবোল চিন্তা করা। দিনের বেলা নানারকম সম্ভব-অসম্ভব কল্পনা করে কখনও খুশি হই, কখনও দুঃখী হই, আবার রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি (সেও তো ওই চিন্তা করাই হল!)। এইসব চিন্তার ফলে কখনও উদ্দীপ্ত হই, কখনও বিমর্ষ হই। আর, বর্তমানের নেতিবাচক পরিবেশে মন কতক্ষণ আনন্দে থাকতে পারে? অধিকাংশ সময়েই তো অবসন্ন, ক্লান্ত, নিরুদ্যম, হতাশ হয়ে থাকে। নাহলে, সমাজে মনোরোগ এত বাড়ছে কেন? অপরাধপ্রবণতা, মানসিক অবসাদ, আত্মহত্যা, হত্যা যেন বেড়েই চলেছে। এইসব শ্বাসরোধী অবস্থা থেকে অন্তত সাময়িকভাবেও পরিত্রাণ পাওয়ার দুরাশায় কিছু নির্বোধ মানুষ কত রকমের ভয়ংকর মাদকদ্রব্যের অসহায় শিকার হয়ে পড়ছে। তাতেও সমস্যা কমার বদলে বেড়েই চলেছে। কত সুখী পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমরা তো অনেকেই কমবেশি এইসব ট্রাজেডির শিকার। একবার দেখুন না, মাতৃসান্নিধ্য কল্পনার এই সহজ পদ্ধতিটা কাজে লাগিয়ে এবং তার দ্বারা মনের শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে নিয়ে এইসব সমস্যাসুরকে বধ করা যায় কি না। এতে আপনার কর্মব্যস্ত জীবনের খানিকটা সময় ছাড়া আর কিছু খরচ হবে না। এর ফলে কত রকম জটিল মনোরোগের—যা বর্তমান সভ্যতার অন্যতম মহামারী হয়ে দেখা দিচ্ছে—সম্ভাবনা থেকেও রেহাই পাবেন, কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট বা কাউনসেলারের চেম্বারে গিয়ে লাইন দিতে হবে না।

কল্পনামাত্রেই অসার, অর্থহীন, আকাশকুসুম—

এটাই বা আপনার মনে হচ্ছে কেন? যে-কল্পনাতে আমাদের উন্নতি হয়, সেইরকম ইতিবাচক বলিষ্ঠ কল্পনা করতে দোষ কোথায়? স্বামী তুরীয়ানন্দজী একটি চিঠিতে একজন ভক্তকে লিখেছিলেন, ‘‘এই বেড়াল বনে গেলে বনবেড়াল হয়। এই imagination (কল্পনা) পাকা হইলেই realisation (সাক্ষাৎকার) হয়। আজকের imagination কালকের realisation। শুধু দৃঢ় হওয়া চাই। আগে imagine করলে পরে realisation হতে পারে, imagination না থাকলে realisation কোথা থেকে হবে? আত্মা প্রথমে শ্রোতব্য, পরে মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য, তৎপরে সাক্ষাৎকৃত হলে realisation এই আর কি।”

ভুলে যাবেন না, ‘‘সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে?” শাস্ত্রের বচন :

‘‘চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥”

—ব্রহ্ম জ্ঞানময়, তাঁর দ্বিতীয় নেই, তিনি অখণ্ড, তাঁর শরীর নেই অর্থাৎ রূপ নেই। সাধকের হিতের জন্য তিনি নিজের নানান মূর্তি রচনা করেছেন। এই ‘রূপকল্পনা’ শব্দটি দেখুন, সর্বব্যাপী সর্বানুস্যূত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে জানতে, বুঝতে বা অনুভব করতে চাইছি কীভাবে? আমাদের কল্পনার চশমা দিয়েই তো তাঁর কোনও একটা বিশেষ ‘রূপ’ (শিব, দুর্গা, কালী, গণেশ, বিষ্ণু ইত্যাদি) দেখতে চাইছি, তাহলে সেখানেও তো কল্পনা আমাদের খুব উপকারী বন্ধুর কাজ করছে। আমরা ‘হৃদি-জয়রামবাটী’তে যাওয়ার জন্য সেই কল্পনাকেই কাজে লাগাচ্ছি। ঠাকুর বলতেন, ‘হৃদয় ডঙ্কামারা জায়গা’, সেই ডঙ্কামারা জায়গাতে ডঙ্কামারা কল্পনার বিশাল শক্তিশালী ভাবতরঙ্গ তুলুন এবার।

এ আমার নিজের মন-গড়া আজগুবি কথা নয় কিন্তু। অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টিশীল এই কল্পনার উপযোগিতা সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর ‘Eternal Values for A Changing Society’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, ‘Faith and Reason’ অংশে। আজ মনোবিজ্ঞানী এবং মনোরোগের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাও তো ‘কল্পনাটক’-এর (কল্পনা+ নাটক= কল্পনাটক) বিধান দিচ্ছেন। আমেরিকার বিখ্যাত মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ ড. ড্যানিয়েল আমেন একে বলেন Imagineering (Imagine+ Engineering)। এই পদ্ধতিটির মূল কথা হচ্ছে, আপনি যা কিছু করতে বা পেতে চাইছেন, তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র মনে মনে ভেবে নিন। তারপরে ভাবুন কীভাবে কোন পথে গেলে আপনার সেই বাঞ্ছাপূরণ হবে। যাত্রাপথের একটা মানসিক মানচিত্র তৈরি করে রাখুন। এবারে সেই মানচিত্র অনুসারে যাত্রা শুরু করুন। যাত্রাকালে সংশয়-রাক্ষসটাকে দেখতে পেলেই মেরে ফেলবেন নির্মমভাবে। সবসময়ে মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন যে আপনি আপনার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছবেনই। অর্থাৎ এখানে আপনি আপনার কল্পনার মুখে দৃঢ়-সংকল্পের রশ্মি লাগিয়ে তাকে আপনার লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করছেন, কল্পনা (Imagination) দিয়ে নির্মাণ (engineering) করছেন আপনার স্বপ্নসৌধ বা স্বপ্নসেতু। এক্ষেত্রে আপনার লক্ষ্য মায়ের কাছে যাওয়া। আপনি সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টিশীল কল্পনার মালমশলা দিয়ে তৈরি করছেন মায়ের কাছে যাওয়ার পাকা রাস্তা। এই মানস-নির্মাণের সময় সবচেয়ে বেশি দরকার ইতিবাচক মানসিকতা এবং ইস্পাত-কঠিন বিশ্বাস—আপনি শীঘ্রই মায়ের দর্শন পেয়ে ধন্য হবেন।

আপনার পুজোর আনন্দ মাটি করব না এসব শুকনো তথ্য দিয়ে। হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার। নিজেই করে দেখুন না, কী হয়! আপনার এইসব মানসভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা একটা খাতায় লিখে রাখবেন, তারিখ ও সময় দিয়ে। যদি ল্যাপটপে

লিখতে অভ্যস্ত হন, তাহলে তাতেই লিখবেন। সফ্‌ট কপি হিসেবে লিখলে সুবিধে অনেক বেশি। আপনি চাইলে আপনার লেখার মধ্যে জয়রামবাটীর বিভিন্ন স্থানের কিছু ছবিও কপি-পেস্ট করে দিতে পারেন। তাতে আপনার ভ্রমণকাহিনির দৃশ্যমূল্য (visual impact) বেড়ে যাবে। কিছু মাতৃসংগীতের অডিও ফাইলও embed করে দিতে পারেন আপনার সফ্‌ট কপিতে। তাকে ক্লিক করলেই আপনি সেই গানটাও শুনতে পারবেন।

আপনার ওইসব মানসভ্রমণকাহিনি আমাদের লিখে জানাতে ভুলবেন না। মানসভ্রমণকাহিনিকে ছোট ভাববেন না যেন। কালকূট (প্রয়াত লেখক সমরেশ বসু) দ্বারাবতীতে (মানে, দ্বারকা) গিয়েছিলেন মানসভ্রমণে, সেই অভিনব ভ্রমণ-কাহিনি তিনি লিখেছিলেন তাঁর 'শাম্ব' নামক গ্রন্থে। জনাদৃত এই বইটি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে (১৯৮০) সম্মানিত হয়েছিল। যাইহোক, কে বলতে পারে, এইভাবে আপনিও হয়তো একদিন স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের 'দর্শন' পেয়ে যাবেন, যেমন পেয়েছিলেন পরম পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। ঘটনাটি শুনবেন? মহারাজ তখন মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে। একদিন ভোরবেলা তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন। মহারাজের কার্যপদ্ধতি খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, তাই এত বড় একটি আনন্দময় পরম অভিজ্ঞতার কথা তিনি সহস্র বিস্মৃতিরাশির অন্ধকার স্রোতে ভেসে যেতে দেননি, সেইদিনই সেটি সবিস্তারে লিখে রেখেছিলেন। মহারাজের মহাসমাধির পরে তাঁর সব কাগজপত্রের মধ্যে সেই মহামূল্যবান তথ্যটি পাওয়া গেছে। সেটি এখানে বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম।

"অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী : ২ জুন, ১৯৬৮ : আজ ভোররাতে, সাড়ে চারটের সময়, আমি একটা সুস্পষ্ট স্বপ্ন দেখলাম। কোনও একটি আশ্রমে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়েছিল, কয়েকজন সন্ন্যাসী ভ্রাতার সঙ্গে আমিও সেখানে গেলাম। দেখলাম সব পূজার সামগ্রী আনা হয়েছে, ফুল, নৈবেদ্য ইত্যাদি সাজানো হয়েছে এবং হচ্ছে। একই মণ্ডপে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা আর স্বামীজীর পূজা হবে, তাঁদের প্রত্যেকের ছবির সামনে তাঁদের সব পূজার পাত্র সাজানো রয়েছে। কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে আমিও এগিয়ে গেলাম শ্রীশ্রীমায়ের ছবির সামনে প্রণাম করতে। যেই প্রণাম করে উঠেছি, অমনি দেখি মা স্বয়ং সশরীরে ছবি থেকে বেরিয়ে আমার গায়ে হাত দিয়ে বললেন কয়েকটি পূজাপাত্র এখনও মাজা হয়নি, সেগুলি মেজে আনতে। মায়ের সেই স্নেহকরপরশনে আমার সর্বাঙ্গে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল, আমি হঠাৎ অনুভব করলাম যে আমার সামনে মায়ের ছবিটা আর নেই, পরম স্নেহময়ী মা সশরীরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আহা! সে কী আনন্দময় অনুভূতি! আমি মায়ের কোলে মাথা রেখে মাকে আবার প্রণাম করলাম, কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালাম—মা, এরপর থেকে তোমার এই স্নেহময়ী রূপ দিনান্তে যেন একবার অন্তত দেখতে পাই। মা সম্মতি দিলেন, তারপরে আমাকে তাঁর বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে দিলেন। মায়ের সেই ভালবাসা, সেই কোমলতা ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না। এইভাবে মায়ের আশীর্বাদধন্য হয়ে পরমানন্দে আমি গেলাম পূজার বাসনগুলো মাজতে। এরপরে আমার ঘুম ভেঙে গেল, মনে গভীর আনন্দ নিয়ে উঠে পড়লাম, জোড়হস্তে প্রণাম করলাম গুরু মহারাজ [ঠাকুর রামকৃষ্ণ] আর রাজা মহারাজের [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] ছবিতে। এবারে ঘড়ির দিকে তাকালাম, চারটে পঁয়ত্রিশ বাজে তখন। শ্রীশ্রীমাকে এই প্রথম আমি স্বপ্নে দেখলাম।"

মায়ের কাছে বারবার যান মানসভ্রমণে। মায়ের অমোঘ আশীর্বাদে আপনারা জীবনযুদ্ধের অপরাজেয় সৈনিক হোন। ✠